দাদু-দিদিমার সাহচর্য এবং অমর্ত্য সেন

বার্মা থেকে ফেরার দুই বছরের মধ্যে অমর্ত্য সেন শান্তিনিকেতনে ছিলেন; দাদু-দিদিমার কাছে থাকতেন এবং স্কুলে হাজিরা দিতেন। ঢাকা থেকে কী কারণে চলে গিয়েছিলেন তা এর আগে উল্লেখ করা হয়েছে।

যে কুটিরে দাদু-দিদিমা বাস করতেন, সেটি শিক্ষকদের জন্য বিশ্বভারতীর দেয়া বাড়িগুলোর একটা সারিতে—নাম গুরুপল্লী (শিক্ষকদের গ্রাম)। মাঝারি কিন্তু মনোমুগ্ধকর এ কুটিরে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ওখানে ছিল একটা রান্নাঘর, একটা খাবার ঘর এবং পড়ার জন্য একটা ছোট জায়গার দুপাশে দুটো শয্যাকক্ষ। দাদু ক্ষিতি মোহন বাড়িতে থাকলে প্রায়ই পড়াশোনার ঘরে থাকতেন; কখনো আবার বারান্দার মেঝেতে নিচু টেবিল পেতে পায়ের ওপর পা তুলে কাজ করতে পছন্দ করতেন।

নাতি-নাতনি ও তাদের বন্ধু-বান্ধবরা চারপাশে দৌড়াদৌড়ি করছে—ভেতরে এবং বাইরে—অথচ দাদু ক্ষিতি মোহন মনোযোগ দিয়ে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন—এ দৃশ্য অমর্ত্য সেনকে অবাক করত। তিনি একমাত্র নাতি, যে নিয়মিতভাবে তাদের সঙ্গে থাকতেন, অন্যরা সাময়িক। কলকাতায় খবরের কাগজে কর্মরত অবিবাহিত বড় মামা প্রায়ই এসে তার অমায়িক আলাপচারিতা ও রসবোধ দিয়ে অমর্ত্যকে রোমাঞ্চিত রাখতেন। তার সঙ্গে মার বড় দুই বোনের আট সন্তানসহ অন্য কাজিনরা ছুটিতে এলে মনে হতো বাড়িটা যেন ভাসমান এক জনগোষ্ঠী। সব কাজিন ভাই-বোন অমর্ত্যের হৃদয়ের কাছাকাছি ছিলেন, তবে তার মধ্যেও অপেক্ষাকৃত বেশি পছন্দের ছিলেন বিহারের গহিন গ্রামে থাকা এক মেজদি। বোন আর ভগ্নিপতির সঙ্গে উপভোগ্য আলাপচারিতায় অমর্ত্য সেন উষর জনহীন প্রান্তরে তাদের বিহারের বাসায় গ্রীষ্মের ছুটির একটা অংশ কাটাতেন; বস্তুত, অল্প বয়স থেকেই গ্রামীণ বিহারে থাকতে ভালোবাসতেন।

তাছাড়া অন্য কাজিনরাও স্কুল ছুটিতে শান্তিনিকেতনে তাদের মা-বাবার বাড়িতে এলে দেখা-সাক্ষাৎ ঘটত। এসব ব্যাপারে অমর্ত্য সেনের অনুভূতি অনুধাবন করার মতো বৈকি, 'আমরা প্রায়ই একে অন্যের বাড়িতে ঘুমাতাম। একই বিছানায় অন্যদের সঙ্গে থাকা আমার জীবনে সাধারণ ঘটনা ছিল। আমরা একটা বড় সংযুক্ত পরিবারের অংশ—এমন উপলব্ধি আমার ও আমার বোনের ওপর বিরাট প্রভাব ফেলেছিল।'

দাদু-দিদিমার সেই বাড়ির একমাত্র বাথরুম ছিল বাইরের দিকে এবং বাড়িতে কতজন আছে তার ওপর নির্ভর করে মাঝেমধ্যে লাইনে দাঁড়ানো ছিল তাদের জীবনের নিয়মিত অংশ। ঢাকায় বিদ্যুতের উজ্জ্বল আলোকিত বাড়ির বিপরীতে এখানে কেরোসিনের বাতি কিন্তু সুখের কথা, কেরোসিনের বাতিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়া অমর্ত্যের পড়াশোনা চালাতে কোনো অসুবিধা হয়নি।

দুই.

দাদু ক্ষিতি মোহনের প্রাত্যহিক অভ্যাসের মধ্যে একটা ছিল বেশ অন্ধকার থাকতেই ৪টার দিকে উঠে তৈরি হয়ে একটা দীর্ঘ হাঁটা। সময় সময় অমর্ত্য সেন সঙ্গে গেলে দাদু আকাশের নক্ষত্রের সঙ্গে তাকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে কিছু তারার সংস্কৃত ও ইংরেজি নাম আওড়াতেন। অমর্ত্য সেন এসব উপভোগ করতেন বটে, তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সে সময় তার সামনে দাদুকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করার অবারিত দ্বার উন্মোচন হতো। হাঁটতে হাঁটতে দাদু নিজের ছোটবেলার গল্প তো করতেনই, তার মধ্যে আলোচনায় গুরুগম্ভীর বিষয়ও ঢুকে পড়ত—যেমন প্রাক-কৃষি উপজাতি জনগোষ্ঠীর জমি জবরদখল করে ভারত তার সঙ্গে কী রকম নিষ্ঠুর আচরণ করছে অথচ স্কুল-হাসপাতাল নির্মাণ করার নামগন্ধও নেই কিংবা তৃতীয় শতকে ভারতের বড় অংশের শাসক বৌদ্ধ সম্রাট অশোক এরই মধ্যে নগরায়িত ভারতে বনে বাস করা মানুষের জন্য বিশেষ উদ্যোগ নিতেন ইত্যাদি। দাদু জোর দিয়ে বলতেন, শহুরে মানুষের মতো উপজাতিদেরও অধিকার আছে। মোট কথা, হাঁটাহাঁটির মধ্যে দাদু-নাতি এক ধরনের ক্লাসে অংশগ্রহণ করতেন, যেখানে অনেক কিছু আলোচ্য বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত ছিল।

এদিকে প্রত্যুষের আগেই মাঝেমধ্যে রবি ঠাকুর বিনা নোটিসে দাদু-দিদিমার কুটিরে এসে হাজির হতেন।

ক্ষিতি মোহন তখনো ঘুমন্ত থাকলে কবি তাৎক্ষণিক কবিতা রচনা করে ফেলতেন—ভোর হয়েছে/ রবি (সূর্য) উঠেছে/ ক্ষিতির (পৃথিবীর) দরজায়/ কী করে হয় এখনো পৃথিবী জাগেনি।

দিদিমা চাইতেন তারা দুজন হাঁটতে যান কিন্তু কামনা থাকত রবীন্দ্রনাথ বারান্দায় বসে অসমাপ্ত স্বতঃস্ফূর্ত কবিতাখানি সমাপ্ত করছেন।

তিন.

১৯৪৪ সালে দাদু-দিদিমা শান্তিনিকেতনের পশ্চিম প্রান্তে যে নতুন বাড়ি বানিয়েছিলেন সেখানে উঠলেন। এটা ক্যাম্পাস থেকে মাইলখানেক দূরে তখনকার ছোট শহর শ্রীপল্লীতে। এ বাড়ি অমর্ত্য সেনের মা-বাবা ঢাকায় থাকতেই শান্তিনিকেতনে প্রতীচী নামে যে নতুন ছোট বাড়ি বানিয়েছিলেন তার ঠিক পরের বাড়ি। শ্রীপল্লীতে যাওয়ার পর অমর্ত্য খাওয়া-দাওয়া করতেন দাদু-দিদিমার সঙ্গে কিন্তু পড়াশোনা আর ঘুম পাশের বাড়ি প্রতীচীতে।

প্রতীচীর প্রতি ক্রমে অনুরক্ত হয়ে পড়ছিলেন অমর্ত্য সেন। বাড়ির একটা অংশে নিজের কোঠায় থাকা যোগেশ্বর নামে এক গৃহভৃত্যের সাহচর্য ছাড়া তিনি ছিলেন মোটামুটি একা। ১৯৪৩ সালের বাংলা দুর্ভিক্ষের সময় ক্ষুধাতুর যোগেশ্বর পাশের জেলা দুমকা থেকে কাজ ও আয়ের সন্ধানে এসেছিল। সে সময় নতুন চাকরের দরকার না থাকা সত্ত্বেও গ্রাম থেকে সদ্য আসা মুখটির দিকে তাকিয়ে তাকে কাজে রাখা হয়। অমর্ত্য সেনের মা তখনকার প্রায় মানবশূন্য প্রতীচীর পুরো দায়িত্ব দিলেন যোগেশ্বরকে এবং একটা সম্পূর্ণ বাড়ি নিজের পেয়ে তার ভালো লেগেছিল। কয়েক বছর পর যখন অমর্ত্যের বয়স দশ এবং যোগেশ্বরের পনেরো, অমর্ত্য সেন প্রতীচীতে ঘুমাতে শুরু করলে যোগেশ্বরকে বলা হলো তার ওপর চোখ রাখতে, যদিও প্রতিবেশী দাদু-দিদিমার কাছে ছিল প্রকৃত দায়িত্ব।

সেই দিনের ক্ষুধাতুর কিশোর যোগেশ্বর অমর্ত্য সেনদের বাড়িতে প্রায় ৭০ বছর বাস করে সবার সেবা করেছে। সে খুশি হয়েছিল একথা শুনে যে অমর্ত্য সেন ১৯৯৮ সালে প্রাপ্ত নোবেল পুরস্কারের অর্থমূল্যে প্রাথমিক শিক্ষায় উৎকর্ষ, মৌলিক স্বাস্থ্য উন্নয়ন ও লিঙ্গসমতা বিধানের লক্ষ্য নিয়ে 'প্রতীচী' নামে দুটো পাবলিক বেনিফিট ট্রাস্ট করেছেন—একটা বাংলাদেশে এবং অন্যটি ভারতে। একটি বড় হাসি দিয়ে যোগেশ্বর নাকি অমর্ত্যকে বলেছিল, 'প্রতীচী ট্রাস্টস নামটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে।'

লক্ষণীয়, অমর্ত্য সেনের পরিবারের জন্য যারা কাজ করছিল, তারা উৎসে উপজাতি (সাঁওতাল) এবং তারা সবাই সময়ের আবর্তনে পরিবারের সদস্যের মতো হয়ে ওঠে। ১৯৭১ সালে অমর্ত্য সেনের বাবার মৃত্যুর পর ২০০৫ সালে ৯০ বছর বয়সে তার মা পরলোক গমন করেন। মৃত্যুর আগে তিনি কঠোর নির্দেশ দিয়ে অমর্ত্যকে বলেছিলেন, তাদের বাড়ির বাগানের দায়িত্বপ্রাপ্ত দুজনসহ প্রতীচীতে কর্মরত ছয়জন চাকরের মধ্যে কাউকে যেন বরখাস্ত করা না হয়। শুধু তা নয়, অবসরে যাওয়ার পরও এদের প্রত্যেকে পূর্ণ বেতন ও চিকিৎসা সুবিধার আওতায় থাকবে। আনন্দের সংবাদ, অমর্ত্য সেন তার মায়ের নির্দেশ মেনে আসছেন এবং বিশেষত প্রত্যেককে আমোদিত রাখার লক্ষ্যে ৪০০ চ্যানেল কেবল সংযোগ স্থাপন করার পর প্রতীচীতে এখনো জীবনের স্পন্দন জাগে। এটা ঠিক যে অনেকে চিরতরে চলে গেছেন কিন্তু তার পরও জীবন থেমে থাকেনি। এখনো বাড়িটি আগের চেয়ে কম প্রকম্পমান নয় দেখে আনন্দে আপ্লুত অমর্ত্য সেন। এ আনন্দের অন্য এক উপাদান হচ্ছে প্রতীচীর সঙ্গে তার মেয়ে অন্তরা, নন্দনা, ইন্দ্রাণী এবং ছেলে কবিরের সম্পৃক্ততা এবং বেশ ঘন ঘন বেড়াতে আসা। করোনার সময় ছাড়া অমর্ত্য সেন নিজেও বছরে প্রায় চারবার এখানে আসেন এবং অনুভব করেন যেন পুরনো পরিচিত নদীতে গোসল সারছেন, যদিও দার্শনিক হুঁশিয়ারি সম্পর্কে তিনি অবগত আছেন যে 'আমরা আসলে একই নদীতে দুবার গোসল করতে পারি না।'

চার.

শিশু বয়সে পাশের বাড়িতে দাদু-দিদিমার সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করতেন। সে সময় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনায় প্রচুর সময় ব্যয় হতো। ১১ বছর বয়সে অমর্ত্য লক্ষ করলেন, দাদু ক্ষিতি মোহন সেন বিবর্তন প্রক্রিয়ায় আগ্রহী হয়ে উঠেছেন অথচ তার মৌলিক বিষয় সংস্কৃত। এ বিষয়ে অমর্ত্য তাকে কিছু অংক যেমন চক্রবৃদ্ধির হার (Compound growth rate) এবং জাদুকরী গুণনীয়কের বিস্তার (Exponential expansion) সম্পর্কে ধারণা দিয়ে সাহায্য করতেন। ক্ষিতি মোহন এমন আনন্দের সঙ্গে সেগুলো গ্রহণ করতেন, যা ছিল অমর্ত্য সেনের প্রত্যাশার বাইরে। তাছাড়া প্রজাতিদের মধ্যে সবচেয়ে উপযোগীর টিকে থাকা, অন্যের ওপর আধিপত্য বিস্তার এবং সংখ্যায় ছাড়িয়ে যাওয়া, কেমন করে টিকে থাকার প্রতিযোগিতা হয় কিংবা কে এবং কীভাবে তা করে ইত্যাদি বিষয় দাদু-নাতির সংলাপে উঠে আসত।

দাদু মনে করতেন না যে এতে ঈশ্বরের হাত আছে, কারণ ঈশ্বর এমন প্রতিযোগিতামূলক পথে কাজ করেন না আর অমর্ত্য সেন মনে করতেন প্রজাতিদের মধ্যে এমন ঘোড়দৌড়ের ব্যবস্থা করার জন্য ঈশ্বর বলে কিছু নেই। কিন্তু শেষ কথা, অমর্ত্য বিস্মিত হতেন এই ভেবে যে শিক্ষাসংক্রান্ত কৃতিত্বের অধিকারী অত বড় মাপের একজন মানুষ এবং যার পড়াশোনার ক্ষেত্র ভিন্ন, অজানা বংশানুগতি সম্পর্কিত বিষয়ে জানতে ১১ বছর বয়সী নাতির সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তিক সহযোগিতায় প্রবেশ করতে প্রস্তুত রয়েছেন।

শান্তিনিকেতন নিয়ে দু-একটা কথা না বললেই নয়। কিছুটা আদর্শিক তুলনার খাতিরে উপনিষদ কিংবা রামায়ণ ও মহাভারতে বেশ উচ্চ প্রশংসিত প্রাচীনতম বিদ্যালয়ের মতো শান্তিনিকেতনকে একটা আশ্রম হিসেবে দেখা হয়। এখানে জানার আগ্রহ গুরুত্ব পায়, প্রতিযোগিতামূলক উৎকর্ষ নয় এবং এখানে পরীক্ষার কৃতিত্ব কিংবা গ্রেড কঠোরভাবে নিরুৎসাহিত করা হয়। ফলে অমর্ত্য সেন ঠাকুরের শুধু কবিতা ও গল্প নয়, শিক্ষার ওপর অনেক পড়াশোনা করেছেন। অন্যদিকে শান্তিনিকেতনে শিক্ষা পর্বের সময় প্রতি বুধবার সকালে অনুষ্ঠিত সমাবেশে ঠাকুর শিক্ষাসংক্রান্ত আলোচনা করতেন। অনুষ্ঠান হতো মন্দিরে ঠিকই, তবে সমাবেশগুলো কোনো বিশেষ ধর্মের ছিল না। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর ক্ষিতি মোহনের দায়িত্ব দাঁড়াল সমাবেশের নেতৃত্ব ও সাপ্তাহিক ভাষণ দেয়া—যে কাজ ঠাকুর করতেন।

পাঁচ.

ধর্মকর্ম নিয়েও দাদু-নাতির মধ্যে বক্তব্য আদান-প্রদান হতো। ১২ বছর বয়সে অমর্ত্য সেন দাদুকে সাফ জানিয়ে দিয়েছিলেন, মন্দিরে সমাবেশে তিনি আসতে অপারগ, কারণ তার কাজ আছে। সুখের বিষয় হলো, অমর্ত্যের কথায় তার দাদু আহত না হয়ে বরং জানতে চাইলেন, 'তুমি মনে হয় মন্দিরের এ আলোচনা পছন্দ করছ না?' অমর্ত্য সেন নীরব রইলে তার দাদু বললেন, 'ঠিক আছে কিন্তু তোমার বয়স বাড়ার সঙ্গে পরিবর্তন আসতে পারে।' তাৎক্ষণিক অমর্ত্য বললেন, 'ধর্ম কোনোভাবে আমাকে আকৃষ্ট করে না এবং আমার ধর্মীয় বিশ্বাস নেই।' দাদু তখন অমর্ত্যকে বলতেন, 'যতক্ষণ না তুমি নিজের ব্যাপারে একনিষ্ঠভাবে চিন্তা করছ, তার আগে দৃঢ় ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রশ্ন ওঠে না। সময়ের বিবর্তনে ওটা আপনাআপনি তোমার কাছে চলে আসবে।'

অমর্ত্য দেখলেন বয়স বাড়ছে কিন্তু ধর্মীয় বিশ্বাস একেবারেই তার দরজায় টোকা দিচ্ছে না। কয়েক বছর পর তিনি দাদুকে বললেন, 'যেসব কঠিন বিষয় ধর্ম সমাধান দিতে চেষ্টা করে সেসব বিষয়ে আমার অব্যাহত চিন্তা সত্ত্বেও সময়ের বিবর্তনে ধর্ম আমার কাছে আসেনি; আপনি ভুল করে থাকতে পারেন।' উত্তরে দাদু বললেন, 'আমার ভুল হয়নি। তুমি ঠিকই ধর্মীয় প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছ এবং আমার মনে হয়, তুমি নিজেকে হিন্দু ধর্মের অন্য ধারা নিরীশ্বরবাদীতে ন্যস্ত করেছ (লোকায়ত)।' একথা বলে তিনি প্রাচীন সংস্কৃতের নিরীশ্বর ও অজ্ঞেয়বাদী গবেষণামূলক আলোচনা গ্রন্থের এক লম্বা তালিকা অমর্ত্য সেনের হাতে তুলে দিলেন এবং সেই ক্ষিতি মোহনের প্রচুর খ্যাতির জন্যই রবীন্দ্রনাথ অনেক অনুনয়-বিনয় করে ('এখনো আশা পরিত্যাগ করিনি') তাকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে আসেন। ঠাকুর তার পাণ্ডিত্য, উদার উৎসর্গ এবং সমাজের সবচেয়ে দরিদ্রের সঙ্গে গভীর সম্পৃক্ততা পছন্দ করতেন। লোভনীয় চাকরির প্রস্তাব ছেড়ে মামুলি বেতনে শান্তিনিকেতনে ৫০ বছরের বেশি পরিতৃপ্ত ও উৎপাদনশীল জীবন কাটিয়েছিলেন ক্ষিতি মোহন। ঠাকুরের দূরদৃষ্টি যেমন ক্ষিতি মোহনকে প্রভাবিত করেছিল, তেমনি তিনি কবিকে তার ধারণা দিয়ে প্রভাবিত করেছিলেন। তারা দুজন ছিলেন একে অন্যের খুব কাছের বন্ধু।

কিন্তু ক্ষিতি মোহনকে ঠাকুর আলিঙ্গনে আবদ্ধ করার পেছনে আরো ঘটনা আছে। শুধু ক্ল্যাসিক্যাল ও বাইবেলি সাহিত্য নয়, এমনকি লোকধর্মীয় ধারণা এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে গ্রামীণ কবিতা ও গানে ক্ষিতি মোহন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিজস্ব উপলব্ধি বিস্তৃত করতে কতটা সাহায্য করেছিলেন, তা ঠাকুর নিজেও অনুমান করতে পারেননি। এগুলো এসেছিল ক্ষিতি মোহনের বিস্তৃত অধ্যয়ন এবং তার যৌবনকাল থেকে কবির ও অন্যদের সংগৃহীত কাজগুলোর ওপর ভিত্তি করে। বিশেষত তিনি মনোযোগ দিয়েছিলেন মুখে মুখে টিকে থাকা কবিরের কবিতায়, যার উৎস ৫০০ বছরের আগে এবং যা মাঝেমধ্যে হয়তো কবিরপন্থী কবি ও গায়কদের হাতে বড় মাত্রায় পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করেছে। হিন্দুত্ব নিয়ে ক্ষিতি মোহনের উদার ও নমনীয় ব্যাখ্যায় ঠাকুর প্রভাবিত ছিলেন সন্দেহ নেই, যেমন অন্য মহান ধর্মের সঙ্গে, বিশেষ করে ইসলাম ধর্মের সঙ্গে ধ্বংসাত্মক নয়, বরং সৃষ্টিশীল মিথস্ক্রিয়া। তবে তার চেয়েও বড় বিষয়, যে পন্থায় ক্ষিতি মোহন তথাকথিত সহজ-সরল গ্রামীণ কবিদের অত্যাধুনিক চিন্তাভাবনার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন, তাতেও ঠাকুর প্রভাবিত হয়েছিলেন।

ছয়.

দাদু ক্ষিতি মোহনকে নিয়ে তার বাবা ভুবন মোহনের গর্বের অন্ত ছিল না; ছেলে লেখাপড়ায় ভালো, প্রবলভাবে প্রত্যাশিত 'পণ্ডিত' উপাধি প্রাপ্ত সংস্কৃত বিষয়ে। অনুমান করা যায়, একজন রক্ষণশীল হিন্দু হিসেবে ভুবন মোহন প্রাচীন হিন্দু সাহিত্য ও সংস্কৃতের ওপর সন্তানের নিয়ন্ত্রণ স্বীকার করতেন বটে, তার পরও কিন্তু সাহিত্যগত ও ধর্মীয় আগ্রহে ক্ষিতি মোহনের আমূল সংস্কারবাদী চিন্তার প্রসারণ তার বাবার কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলে দিয়েছিল। বস্তুত, ভুবন মোহন ভীত হয়ে ভাবতে শুরু করলেন, দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্বাসে ছেলে বোধ হয় 'পশ্চিমা রাস্তায়' হাঁটতে পারে এবং সেটা বন্ধ করতে যা দরকার তাই তিনি করবেন। ক্ষিতি মোহন ক্রমবর্ধিষ্ণুভাবে হিন্দু ভক্তি আন্দোলনের সাহিত্যের সঙ্গে মুসলিম সুফিদের কবিতা ও গানের শক্তি ও সৌন্দর্যের দ্বারা বিমোহিত হয়ে পড়ছিলেন এবং এটা সত্যি যে তার উদার মনোভাব একেবারে বিভিন্ন দিকে যাচ্ছিল এবং সেটা যে সত্যি তার প্রমাণ মাত্র ১৪ বছর বয়সে ক্ষিতি মোহন সিদ্ধান্ত নিলেন যে তিনি কবিরের বহুত্ববাদী ধর্মীয় প্রথায় যোগ দেবেন অর্থাৎ 'কবিরের পথ' অনুসরণ করবেন, যা বড় পরিসরে হিন্দু ও মুসলিম উভয় ধর্মের ধারণা ধারণ করে এবং শত শত বছর ধরে গাওয়া ও আবৃত্তি করা পদ্য সৃষ্টি করেছে।

কবিরের পথে যোগ দেয়া ছিল তার দাদুর জন্য আনুষ্ঠানিক কর্ম কিন্তু এর মনের উদারতা ক্ষিতি মোহনকে যুক্তিযুক্ত অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নিজের জীবন নিজের মতো করে পরিচালিত করার সুযোগ এনে দিল। ১৫ শতকের মধ্যভাগে উল্লিখিত কবির এক মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি হিন্দু ও মুসলিম উভয় ধর্মের বিষয়বস্তু ও সাহিত্যিক ট্র্যাডিশন থেকে অভিজ্ঞতা নিতেন।

এদিকে বিকশিত বিশ্বাসের সঙ্গে ক্ষিতি মোহনের জীবনেও পরিবর্তন এল। ১৮৯৭ সালে চাম্বা যাওয়ার আগে মাত্র ১৭ বছর বয়সে তিনি উত্তর ও পশ্চিম ভারত ভ্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। এ ভ্রমণের উদ্দেশ্য ছিল কবির, দাদু এবং অন্য যারা মুসলিম ও হিন্দু চিন্তার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে নিজের মতো করে ধর্ম পালনে উৎসাহী ছিলেন, তাদের সবার কবিতা ও গান সংগ্রহ ও সংকলন করা। বলা বাহুল্য, যেহেতু কবির ও অন্য সমমনাদের ভক্তরা ভারতের অনেক প্রদেশে বিস্তৃত ছিল, এর অর্থ ছিল বিশাল ভূখণ্ড ভ্রমণ করা। যখন তিনি গভীরভাবে কবির ও তার প্রথা নিয়ে অধ্যয়ন করছিলেন, ক্ষিতি মোহন জানতে পারলেন যে এমনকি তার দেশীয় বাংলায় সমৃদ্ধ ও সুন্দরভাবে হিন্দু-মুসলিম মিথস্ক্রিয়া কাজ করে; এদের দৃষ্টিভঙ্গি বিশাল, তারা দুই ধর্মের ভাবনা ধারণ করে এবং দুই ধর্মের অনুসারী আকৃষ্ট করে। অতএব, ১৮৯৭-৯৮ সালে তিনি বাংলার বাউলদের কবিতা ও গানের খোঁজখবর নেয়া শুরু করলেন। এসব ভ্রমণ ও বিস্তারিত নথিভুক্তকরণে ক্ষিতি মোহনের দৃঢ় প্রত্যয় অনেক সময় দাবি করত। বাংলার মহান লেখক ও পণ্ডিত সৈয়দ মুজতবা আলী এ পরিবারের বন্ধু ছিলেন এবং ক্ষিতি মোহনের সঙ্গে কাজ করেছেন। তিনি বলেছেন, ক্ষিতি মোহনের গ্রামীণ মৌখিক বিষয়বস্তু তিনি পড়েছেন এবং পর্যালোচনা করে পেয়েছেন যে ক্ল্যাসিক্যাল পণ্ডিতরা যেমন প্রাচীন বিষয়বস্তুতে প্রয়োগ করেছিলেন, এগুলোয়ও তেমনি বৈজ্ঞানিক সম্পূর্ণতা আছে (Scientific thoroughness)।

হিন্দু ভক্তি আন্দোলন ও ইসলামিক সুফি প্রথার মধ্যকার বড় সেতু হিসেবে বিরাজ করছিল এমন পুরনো কিন্তু জীবন্ত পদ্যগুলো ঠাকুরকে বেশ ভালোভাবে নাড়া দেয়। রবীন্দ্রনাথ ক্ষিতি মোহনের সংগ্রহ থেকে 'কবিরের একশ কবিতা' এভেলিন আন্ডারহিলের সাহায্য নিয়ে ইংরেজি অনুবাদ করিয়েছিলেন এবং সেটা প্রকাশিত হয় ১৯১৫ সালে তার সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির দুই বছর পর। ক্ষিতি মোহনের সংগ্রহের ওপর ভিত্তি করে কবিরের পদ্য অন্য এক ইংরেজি অনুবাদে এজরা পাউন্ডও জড়িত ছিলেন।

সাত.

কবির, দাদু এবং অন্য বাউলদের মৌখিক কবিতায় ক্ষিতি মোহনের জড়িত থাকার একটা কারণ তো অবশ্যই ভারতের লোকসাহিত্যের প্রতি সুবিচার করা, কেননা অভিজাত তন্ত্রের পক্ষপাতের কারণে তা অবহেলিত ছিল কিন্তু পাশাপাশি অন্য গুরুত্বপূর্ণ কারণটি ছিল ভারতের হিন্দু ও মুসলিম প্রথার মধ্যকার মিথস্ক্রিয়ার দীর্ঘ ইতিহাস অনুসন্ধানে গভীরভাবে সম্পৃক্ত হওয়া। অনেক উপলব্ধীয় হিন্দু তান্ত্রিকের দাবির বিপরীতে ক্ষিতি মোহনের ধারণা ছিল এই যে মুসলিম সংস্কৃতি ও চিন্তা দ্বারা হিন্দুত্ব তাৎপর্যপূর্ণভাবে সমৃদ্ধ হয়েছিল।

বলে রাখা দরকার, ছেলের এ পরিবর্তনে বাবা ভুবন মোহনের অনুমোদন না থাকলেও মা দয়াময়ীর কাছ থেকে ক্ষিতি সেন দৃঢ় সমর্থন পেয়েছিলেন। এই মহীয়সী একটা স্বাধীন জীবন বেছে নিতে এবং ক্ল্যাসিক্যাল সংস্কৃত অধ্যয়নের সঙ্গে গ্রামীণ ধর্মীয় ও সাহিত্য সম্পর্কিত সংমিশ্রণে নিজের প্রাধিকার পছন্দ করতে ছেলেকে সাহায্য করেছেন, যেমনটি করেছেন গ্রামীণ কবিতা ও লোকগান সংগ্রহ করতে ভারত ভ্রমণে। তেমনি অমর্ত্য সেনের দিদিমা কিরণ বালা একজন খুব দক্ষ এবং সফল প্রকৌশলীর মেয়ে। ক্ষিতি মোহন প্রায় সবকিছুর জন্য স্ত্রীর ওপর নির্ভর করতেন এবং তাদের সম্পর্ক ছিল অভাবনীয় ঘনিষ্ঠ।

আট.

ক্ষিতি মোহন খুব ভালো চিঠি লিখতে পারতেন, যার বেশির ভাগ ছিল চিন্তাভাবনা ভাগ করে নিতে কিরণ বালার কাছে লেখা। যেমন ১৯২৪ সালে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জাপান ও চীন সফরে গিয়ে সময় পেলেই কিরণ বালার কাছে একটা চিঠি লিখতে বসতেন যেন ওটা তার প্রিয় কাজ ছিল। অন্যদিকে বাড়িতে কিরণ বালা হয়তো ব্যস্ত থাকতেন স্বামীর কাছ থেকে পাওয়া চিঠির স্তূপ পড়তে পড়তে।

ক্ষিতি মোহনের জীবনীকার প্রণতি মুখোপাধ্যায় এমন কিছু চিঠি সংগ্রহ করেছিলেন, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বিয়ের পরপর ক্ষিতি মোহনের লেখা ১৯০২ সালের ২৯ জুনের চিঠিটা। কিরণ বালা তখন বাবার বাড়িতে বেড়াতে গেছেন। ক্ষিতি মোহন প্রথম চিঠির মাধ্যমে বোঝাতে চেয়েছেন তিনি কিরণ বালাকে বিয়ে করে কতখানি খুশি এবং লিখলেন, 'সুখ মাপার জন্য যদি একটা ধার্মোমিটার থাকত, আমি তোমাকে ব্যাখ্যা করতে পারতাম আমি কতখানি খুশি!'

ইদানীং এ লাইনটা অমর্ত্য সেনের মনে আসে যখন সুখ মাপার মাপকাঠি নিয়ে নিবিষ্ট মনোযোগ নিচ্ছে তার বন্ধু অর্থনীতিবিদ রিচার্ড লেয়ার থেকে ভুটানের লোকহিতকর রাজা পর্যন্ত।

পাদটীকা : অমর্ত্য সেন তার ছেলের নাম রাখলেন কবির। এজন্য অংশত দায়ী ঐতিহাসিক কবিরের ধারণা তাকে আন্দোলিত করেছিল এবং অন্য একটা কারণও—ছেলের ইহুদি মা ইভা নামটা পছন্দ করেছে। ইভার ভালো লাগার ব্যাপারে অমর্ত্য সেনকে বলেছিলেন, 'এটা একেবারে ঠিক যে, যে ছেলের বাবা হিন্দু এবং মা ইহুদি, তার একটা সুন্দর মুসলিম নাম থাকা উচিত।'

আব্দুল বায়েস : অর্থনীতির অধ্যাপক; জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ও ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির খণ্ডকালীন শিক্ষক